Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.116-128
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মেখলীগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন নদ-নদী, কুড়া ও জলাশয়: একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা

প্রসেনজিৎ রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Mekhliganj is a subdivision of Cooch Behar district in the state of West Bengal. There are total two blocks in the subdivision, one Mekhliganj block and one Haldibari block. Teesta flows through this subdivision. Also several small rivers like Dharla River, Jalsuya River, Sungli River, Saniyajan River, Sati River, Giriya River, Buri Teesta River, Sutunga River, Dharaikuri River, Singira River etc. flow through this subdivision. Where most rivers and their various branches flow from one state to another. So the population here is like this river – Rajvanshi, Bodo, Rava, Kharu etc. live here. And where there is more population, there is more linguistic diversity. Yet it is as if the story is garlanded with the same thread. That is what comes up in the context of these rivers and reservoirs. So the social and cultural ties of the people of this region are unbreakable with water culture. Worshiping riverine culture, marrying river to river to mark the cultural milieu of the region. Various myths and worship of water also come up in this context.

Keyword : myths and worship, Mekhliganj, Dharla River, Jalsuya River, Sungli River, Saniajan River, Sati River, Giria River, Buri Teesta River, Sutunga River, Cooch Behar.

মূল আলোচনা:

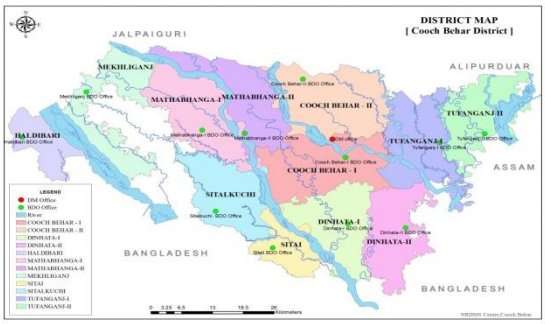

কোচবিহার জেলার মানচিত্র

মেখলীগঞ্জ হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার জেলার একটি মহকুমা। মহকুমাটিতে মোট দুটি ব্লক, একটি মেখলীগঞ্জ ব্লক আর একটি হলদিবাড়ি ব্লক। তিস্তা নদী এই দুই ব্লকের মধদিয়ে বয়ে গেছে। মেখলীগঞ্জ মহকুমার মোট জনসংখ্যার 9.91% শহরে বাস করে এবং 90.09% গ্রামে বাস করে। ভারতের 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে মেখলীগঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছিল 9,217 যার মধ্যে 4,664 (51%) পুরুষ এবং 4,463 (49%) মহিলা। 0-6 বছর বয়সের জনসংখ্যা ছিল 1,098। এই মহকুমার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে তিস্তা। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো নদ-নদী যেমন ধরলা নদ, জলসূয়া নদ, সুংলি নদী, সানিয়াজান নদ, সতী নদী, গিরিয়া নদ, বুড়ি তিস্তা নদী, সুটুঙ্গা নদী, ধারাইকুড়ি নদী, সিঙ্গিরা নদ প্রভৃতি এই মহকুমার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। বাংলার নদ-নদী সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছিলেন–

"বাঙালার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙলার ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী।"[১]

যেখানে সবচেয়ে বেশি নদ-নদী এবং তাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। তাই এই নদীর মতোই এখানকার জনবিন্যাস – রাজবংশী, সাঁওতালী, নেপালি, বোডো, রাভা, খারু প্রভৃতি জনজাতির বসবাস। আর যেখানে যত বেশি জনবিন্যাস, সেখানে ততোবেশি ভাষাগত ভিন্নতা। তবু যেন একই সুঁতোয় গাথা মালা। এই নদ-নদী-জলাশয়ের প্রসঙ্গে উঠে আসে সেই কথাই। যে নদী সিকিম পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে এসেছে সমতলে। এই প্রবাহ পথেই নদীটির নাম বারবার গেছে পাল্টে। নদীটি যখন যে জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তখন সেই এলাকার আঞ্চলিক শব্দের দ্বারা নদীর নামকরণ চিহ্নিত হয়েছে। তাই দেখা গেছে, একটি নদী উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন নামে খ্যাত হয়েছে। পাহাড়ের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় নদীটির এক নাম আবার সমতলে নদীটির আরেক নাম। যেমন – ডুডুয়া = দৈদুয়া > ডুডুয়া। বিভিন্ন জনজাতি ও তাঁদের ভাষাগত ভিন্নতার জন্য এই নামবৈচিত্র্য। তবে এই নামকরণের পেছনে কাজ করেছে নদীটির গঠন প্রকৃতি, ভূমিরূপ, নদীর নাব্যতা, নদীর গতিপথের রূপ। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের নদ-নদীগুলির ক্ষেত্রে এই তথ্য যথাযথ ভাবে প্রযোজ্য। কারণ এখানকার জনজাতি, বিশেষ করে আদিবাসী জনজাতিরা হলেন প্রকৃতি উপাসক। আর তাই প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে দেখা গেছে তাদের নামকরণের রীতি। যেমন – কোচবিহারের রাজবংশী জনজাতির মানুষেরা তাঁদের নবজাত শিশুর নামকরণ করেন বিভিন্ন ঋতুর নামানুসারে, অথবা মাস বা বারের নাম অনুসারে। যেমন - বৈশাখ মাসে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে নাম রাখা হত – বৈশাখু / বৈশাকু। জোনাক (চাঁদনী রাতে) রাতে জন্ম নিলে নাম হত – জোনাকু। সোম বারে জন্ম নিলে নাম হয় – সোমারু ইত্যাদি। আবার গঠন বৈশিষ্ঠ্য বা চরিত্রগত বিচারেও নামকরণের রীতি দেখা গেছে, যেমন – কোনো শিশু যদি তার বয়সের অনুপাতে কম লম্বা হয়, তার নাম রাখা হয় বাংঠু/বাংরু (বাংলা অর্থ বেটে), যদি কেউ বয়সের অনুপাতে কম বোঝে, তখন তার নাম দেওয়া হয় – আজালা। লিঙ্গভেদে শব্দের প্রয়োগও ঘটে থাকে। ছেলে হলে আজালা, মেয়ে হলে আজিলি।

আর তাই একটি নদী যখন এই জনজাতিপূর্ণ এলাকার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তখন এই নামকরণের পদ্ধতি তাতে নিহিত হবে, এটাই স্বাভাবিক এবং তা অবশ্যই সেখানকার আঞ্চলিক ভাষায়। শুধু নদীর নামই নয়, নদীর মিথকথা, নদীকেন্দ্রিক গান ও ছড়াও এ অঞ্চলে বেশ প্রচলিত। মেখলীগঞ্জের জামালদহ এলাকায় প্রবাহিত কচুয়া নদীকে কেন্দ্র করে একটি ছড়া উল্লেখ করা হল –

"নদীর নাম কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া"[২]

এই প্রবন্ধে মেখলীগঞ্জ মহকুমার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হওয়া নদ-নদী, বিভিন্ন কুড়ার নাম ও বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হওয়া জলাশয়ের নামগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জলসংস্কৃতি ও নদ-নদীর মিথ কথাও উঠে এসেছে এই আলোচনায়। নীহাররঞ্জন রায় বাংলার এই সব নদ-নদী সম্পর্কে বলেছেন –

> "অনেক পুরাতন পথ মরিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণা ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে নূতন নদীর নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব নদ-নদীর ইতিহাস বাঙলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ-সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা; মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুর বিকাশ।"[৩]

আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে, কুড়া হল নদ-নদী কেন্দ্রিক একটি জলবাচক শব্দ। 'কুড়া' শব্দটির অর্থ হল সুগভীর জলাশয়। এই কুড়া শব্দটিকে আবার বিভিন্ন এলাকায় 'চাত্রা, ডোং বলা হয়'। ড. রমা দাস তাঁর 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের গ্রামনাম প্রসঙ্গ' বইয়ে কুড়া সম্পর্কে বলেছেন –

> "প্রান্ত উত্তরবঙ্গের নদীকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক প্রবাহের প্রত্নস্বরূপ জলবাচক শব্দ 'কুড়া'। কুড়া অর্থ গভীর জলাধার। নদীর থেকে কুড়া সৃষ্টি। অতীতে নদীর অনবরত গতি পরিবর্তনের ফলে অসংখ্য কুড়ার সৃষ্টি হয়েছে, বহু কুড়া পলি, বালির দ্বারা ভরাট হয়ে গেছে। নদীর পূর্বের অবস্থানের সাক্ষীও হয়েছে একাধিক কুড়াকেন্দ্রিক গ্রামনাম।"[৪]

নদীর বিভিন্ন গতীপথের মধ্যে এই কুড়ার সৃষ্টি হয়। এই কুড়া সৃষ্টির পেছনে অনেক ভৌগোলিক কারণ নিহিত রয়েছে, অতীতের নদীগুলো ছিল খরপ্রভা, অর্থাৎ প্রচন্ড স্রোতস্বিনী। এই স্রোতো প্রবাহের মধ্যে নদীর প্রবাহ পথের পরিবর্তন ঘটলে কুড়ার সৃষ্টি হয়। তবে লোকসমাজে এই কুড়া নিয়ে রয়েছে নানান মিথ প্রসঙ্গ। কুড়াতে যেহেতু সারা বছর প্রচুর জল থাকতো, সে কারণে কুড়ার মধ্যে প্রচুর পরিমানে মাছও পাওয়া যেতো। সেই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করেও রয়েছে নানান মিথকথা। কুড়ায় মাছ ধরতে গেলে তার আগে সেই কুড়ার দেবতাকে পূজা দিতে হত। সমীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতিটি কুড়ার নামের সাথে কোনো না কোনো দেব-

দেবীর নাম জুড়ে আছে। মানুষ ভক্তি ভরে সেই দেবতার পূজা করে থাকেন। আবার দেখা গেছে নদীর ধারে কুড়ার পাশেই সেই কুড়ার দেবতার মন্দির বা থান। লোক মুখে শোনা যায়, একটি কুড়ার গভীরতা এতটাই হয় যে, সেখানে দশটা বাঁশ গাছও নাগাল পায় না। যদিও বর্তমানে কুড়াগুলোতে আগের মতো গভীরতা নাই, পলি ও বালিতে ভরাট হয়ে গেছে। মেখলীগঞ্জ মহকুমার বিস্তৃর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া নদ-নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ও সেই সাথে নদী বিভিন্ন কুড়ার নামগুলি নিয়ে এই আলোচনা।

জলাশয় বলতে এখানে ডোবা, নালা, কুরা, পেরি, ছোরা, ডারা, চাত্রা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাথে জল সম্পর্কিত। মেখলীগঞ্জ মহকুমার বিস্তৃর্ণ এলাকায় শুধু নদ-নদীই নয়, সেই নদ-নদী ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ছোট বড় এই সব নালা, ছোরা, পেরি, ডারা, দীঘি, চাত্রা ইত্যাদির নামও। এই নাম শব্দগুলির উৎপত্তির পেছনেও রয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। সেই সাথে এই নাম শব্দগুলির সৃষ্টির পেছনে আছে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব। একটু ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এই জলবাচক শব্দগুলি শুধুই শব্দ নয়, এই শব্দগুলির যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক অর্থ আছে, তেমনি এই শব্দগুলির মধ্য দিয়ে সেই এলাকার ভাষিক পরিচয়টিও খুব সুন্দর ভাবে পরিস্ফুটিত হয়। বোঝা যায় সেই অঞ্চলে আগে কোন জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করেছেন। তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি কি ছিল। আসলে একটি জলবাচক শব্দ নিছক শব্দই নয়, তা ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে দেখা দেয়। সময়ের সাথে সাথে একটি শব্দেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে, তবে সে পরিবর্তন ঘটে আঞ্চলিকতার কারণে, শব্দটির মূল রূপ কিন্তু হাঁড়িয়ে যায় না। ধরলা নদ সম্পর্কে W.W. Hunter বলেছিলেন

> – "The name of this river is said to be derived from the Sanskrit dhavla (vuig, Dholla), white; but the name is universally pronounced Dharla. White, it may be observed is by no means a suitable epithet, for the stream of the Dharla, although clear in its upper course, becomes eventually very dirt. Its fountain heads lie in the bosom of the hills, and it enters the sate at a place called Lafabari (In taluk Kamat Changrabandha). Its whole course is most involved and the old beds, affluents, and tributaries form a perfect network. The Chhoto or little Torsha, and Buri, or old Torsha are all connected with the main stream of the Dharla."[৫]

মেখলীগঞ্জ মহকুমার নদ-নদী :

তিস্তা নদী: W.W. Humter, এইচ. চৌধুরী, চারুচন্দ্র সান্যাল প্রমূখ তিস্তার অবস্থানকে লক্ষ্য রেখে বলেছিলেন – 'তিস্তা' শব্দটি সংস্কৃত 'ত্রিস্রোতা' থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একাধিক পণ্ডিত বলেছেন – 'তিস্তা' শব্দটি মূলে ভোটধর্মী প্রভাবজাত ছিল। তিস্তা নদী সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছিলেন –

> "নরতত্ত্বের দিক হইতে মোঙ্গোলীয় রক্তপ্রবাহ বাঙালীর মধ্যে যেমন ক্ষীণ ও শীর্ণ মোঙ্গোলীয় ভাষা-প্রভাবও তাহাই। তবে উত্তরতম ও পূর্বতম প্রান্তের মোঙ্গোলপৃষ্ট লোকদের ভিতর চলতি বুলিতে কিছু ভোট-ব্রহ্ম শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। আর অন্তত একটি নদীর নাম যে ভোট-ব্রহ্ম ভাষা হইতে গৃহীত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়; এই নদীটি দিস্তাং বা তিস্তা যাহার পরবর্তী সংস্কৃত রূপ ত্রিস্রোতা।"[৬]

একই কথার সূত্র ধরে অধ্যাপক দীপক কুমার রায় বলেছেন –

> "এতদ অঞ্চলের ইন্দো-মঙ্গোলয়েড (Indo-mongoloid) জনস্রোতের অন্যতম সাক্ষী তিস্তা শব্দটি। তিব্বতী ভাষায় 'তি' জলবাচক শব্দ। তি, তৈ, দৈ শব্দগুলি তিব্বতধর্মী (Tibeto-Burmese) ভাষায় জলবাচক শব্দ। লেপচা ভাষায় তিস্তাকে বলা হয় 'তি-সা-থা' (THI-SA-THA)। অর্থ 'তোমার সাথে মিলিত হতে চাই। তিস্তা তাই মিলিত হয়েছে রঙ্গীতের (দার্জিলিং জেলা) সঙ্গে। তিস্তা-রঙ্গীতকে নিয়ে লিম্বু, লেপচা সমাজে লোককথা প্রচলিত আছে।"[৭]

নদীটি সিকিমের পাহাড় থে উৎপন্ন হয়ে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার হয়ে বাংলাদেশের রংপুর জেলার চিলমারি বন্দরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০ মাইল। এই নদীর অনেকগুলি শাখা নদী মরা তিস্তা, বুড়ি তিস্তা নামে কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ি ব্লকের মধ্যদিয়ে একসময় প্রবাহিত হত। আজও তার কিছু কিছু প্রবাহ বর্তমান। এই নদী পথ ধরেই একসময় মেখলীগঞ্জ থেকে বাংলাদেশের রংপুর, চট্টগ্রাম, কালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তামাক রপ্তানি হত।

তিস্তা বুড়ি ঠাকুর

খট্টিমারী নদী : দুই দল বিশিষ্ট শব্দ 'খট্টি' ও 'মারী' মিলে খট্টিমারি আদতে একটি জলবাচক শব্দ। 'মারী' প্রত্যয়ের ব্যবহার থেকে স্ত্রী লিঙ্গ বাচক শব্দ তা বোঝা যায়। আদতে এটি নদী। খট্টি মাছ যেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আর যেখানে মাছ থাকে সেখানে জলাভূমি থাকবে না, তা কখনও হয় না। 'মারী' প্রত্যয় কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় নিচু ভূমি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মারী' প্রসঙ্গে ড. রমা দাস বলেছেন–

> "মারী জলবাচক শব্দ। মারী অর্থ নিচু জমি, যেখানে জল থাকে। এইসব জলা জমি অথবা জলাশয়ের মধ্যে যখন যে মাছের আধিক্য বেশি, সেই মাছের নামেই তখন সেই অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। যেমন – টাকুয়ামারী (তুফানগঞ্জ), চান্দামারী (কোচবিহার), শৌলমারী (মেখলীগঞ্জ)।"[৮]

আঞ্চলিক অর্থে যে নদীতে খট্টিমাছ প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় বা ধরা হয় সেই নদীই খট্টিমারি নদী। এই নদীটি সানিয়াজান নদীর একটি উপনদী। নদীটি উৎসমুখে সরু নালার মতো দেখতে হলেও প্রবাহপথ বাড়ার সাথে সাথে নদীর বিশালতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীটি জলপাইগুড়ি জেলার মণিবাড়ি, রাজারহাট এলাকার দোলার জল নিয়ে প্রবাহ শুরু করে জোরপাকিরির আগে খট্টিমারি বাজারের পাশ দিয়ে পূর্ব দক্ষিণ কোন বরাবর প্রবাহিত হয়ে হেলাকারিকি হাটের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে সানিয়াজান নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীর মূল প্রবাহ শুরু হয়েছে খট্টিমারি এলাকায়। এই অংশে খট্টিমারি ব্রিজের পাশে শ্মশান ও দেবতার মন্দির রয়েছে।

সানিয়াজান নদী : স্থানিক উচ্চারণে সিনজান বা সাইনজান নদী। সানিয়া + জান = সানিয়াজান। শব্দটিতে দুটি দল রয়েছে। আরবি ভাষায় 'সানিয়া' শব্দের অর্থ দ্বিতীয়, আর জান' শব্দের অর্থ প্রাণ। সেই হিসেবে লোকজ অর্থ দাঁড়ায় দ্বিতীয় প্রাণ। আবার 'সেনিয়া' বলতে রাজবংশী ভাষায় একধরণের বিশেষ বস্তুকে বোঝায়। যা দিয়ে রাজবংশী সমাজের মহিলারা ঘর মোছেন। পাটার কোষ দিয়ে তৈরি একধরণের মাটির ঘর মোছার বস্তু বিশেষ। এই সানিয়ায় যেমন সব সময় জল থাকে না। তেমনি এই নদীটিতেও বর্ষা ছাড়া অন্যান্য সময় জল থাকেনা বললেই চলে। আর জান শব্দের লোক অর্থ হল ছোট প্রবাহ।

> "প্রান্ত উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমের একটি জলবাচক শব্দ 'জান'। জান নদী থেকে সৃষ্ট। অসমীয়া ও উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষায় 'জান' শব্দটি প্রচলিত। জান অর্থ জুরি, ছোট নদী।"[৯]

সেই অর্থে নদীর চরিত্রে সাথে নামটির বেশ অর্থগত মিল রয়েছে। স্থানীয় উচ্চারণে অনেকে আবার নদীটিকে সেনিয়াজান বলে থাকেন। নদীটি কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটির উৎস জলপাইগুড়ি জেলার বালাসন এলাকার বালাসন নামে একটি নালার প্রবাহ থেকে শুরু। এই প্রবাহ বালাসন এলাকার দোলার জল ও সেখানে অবস্থিত রেলের কুড়ার জল নিয়ে ময়নাগুড়ি থেকে চ্যংরাবান্ধা হাইরোড অতিক্রম করে বানিয়াবাড়ির পাশ দিয়ে সানিয়াজান নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহের সাথে খয়ের খাল এলাকার মাগোসানীধামের প্রবাহীসে যুক্ত হয়। এর পর মিলিত

প্রবাহ অর্জুনের বাড়ি, নাউয়াপাড়া হয়ে ডাঙ্গাপাড়ার (বান্ধের কালী) পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এখানে এই মূল সানিয়াজান নদীর সাথে খট্টিমারি থেকে এসে হেলাপাকিরি বাজারের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসা খট্টিমারি নালাটি মিলিত হয়। এরপর এই মিলিত প্রবাহ দক্ষিণ-পূর্ব দিক বরাবর প্রবাহিত হয়ে ভোটের বাড়ি, যুগিপাড়া, সুক্টাবাড়ি মাস্টার পাড়ার মাঝ বরাবর প্রবাহিত হওয়ার সময় ধাইধাই ঘাটের কাছে সিঙ্গিমারি নামে অপর একটি নদী এসে এর সাথে মিলিত হয়। এরপর মিলিত প্রবাহ কাঠালবাড়ি দিয়ে বি এস বাড়ি ক্যাম্প অতিক্রম করে কলোনি বাজারের পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহ উত্তর খড়খড়িয়া এলাকায় ভারত বাংলাদেশ বর্ডার ধরে প্রবাহিত হতে থাকে। ফুলকাডাব্রি, কাংরাতলি, ডাঙ্গার হাটের পাশ দিয়ে ডাকুর কুড়া হয়ে নদীটি প্রবাহিত হয়ে কাশিয়াবাড়ি এলাকায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর নদীটি কলসির মুখ এলাকায় ভারতে প্রবেশ করে বালাপুকুরি, ডাকুয়ারটারি, পূর্ব বাজেজামা ফুলকাডাব্রি, পূর্ব বাজেজামা কুচলিবাড়ি হয়ে নদীটি পুরোপুরি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে প্রবেশ করেই নদীটি দুটি ভাগ হয়ে প্রবাহিত হয়। এর একটি প্রবাহ ধবলা সতী নামে প্রবাহিত এবং অপর প্রভাহটি সানিয়াজান নামে প্রবাহিত। বাংলাদেশের ভাংগাটারি বিজিপি ক্যাম্পের পাশেই এই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত সতী নদী। এই সানিয়াজান নদী বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে তিস্তা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে বাংলাদেশের গাড্ডিমারি এলাকায়।

সানিয়াজান নদী

এই নদীর প্রবাহ পথের বিভিন্ন ঘাটে বারুণী স্নান ও বারুণী মেলা বসে। ডাঙ্গার হাটের কাছে বান্নিমেলা একটি বড় মেলা। এই এলাকার বিভিন্ন স্থানের লোকেরা আসেন মেলা দেখতে ও পূজা করতে। বারুণী শব্দটি মেখলীগঞ্জ এর ডাঙ্গার হাট এলাকায় বান্নিছিলান বলে অবিহিত হয়। বারুণী স্নান > বান্নিছিলান। এছাড়াও ভোটবাড়ি অঞ্চলের মাধববাড়িতে রয়েছে নদীর উত্তরাবাক, সেখানে মা গঙ্গার পূজা হয়। সানিয়াজান নদীর

ডাকুর ঘাটে শ্মশানকালীর মেলা ও গঙ্গা স্নান মেলা হয়। ছয় মেইল (তিনবিঘা) এলাকায় নদীর ধারে বারুণি ছিলান ও গঙ্গা মেলা বসে।

সতী নদী : সতী নদী সানিয়াজের একটি শাখা নদী। এই নদীটি ব্রহ্মোত্তর কুচলীবাড়ির কাছে সানিয়াজান নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। যে জায়গায় মিলিত হয়েছে সেই অংশটিকে দোমুখা/দুমকা নামেও পরিচিত। এই নদী আবার সাঁকোয়া বা স্রোতি বা সুতি নামেও আঞ্চলিক এলাকায় পরিচিত আছে। শাখা নদী সতীকে নিয়েও রয়েছে নানান মিথ প্রসঙ্গ। অনেকে মনে করেন এই নদী দিয়ে বেহুলা তাঁর মৃত স্বামীকে নিয়ে শিবপুরে গিয়েছিলেন। এই নদীটি নিজতরফ অঞ্চলের ভাণ্ডাণীর কাছে ভাট্টাকুড়ায় উৎপন্ন হয়ে মেখলীগঞ্জ শরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর নদীটি দহগ্রাম হয়ে ৯৭ দেবীর ডাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ১১৭ জিগাবাড়ি, ৯৯ ফুলকাডাব্রি, ১১০ জামালদা, ১০৬ বড় কুচলিবাড়ি হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সানিয়াজান নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। নদীটি এক সময় খরস্রোতা ছিল, এখন নদীটির নাব্যতা কমে গিয়েছে। এখনও এই নদী গর্ভে নৌকাসহ অনেক কিছুই পাওয়া যায়। আদতে এই নদী তীরবর্তী এলাকায় একসময় স্থানীয় এক নারীর স্বামীর মৃত্যু হলে, সে তার স্বামীর সাথে সহমরণ / স্বামীর চিতায় নিজের জীবন দান করেছিলেন বলে সতী হয়েছিলেন। সতী নদীর আয়তন খুব বড় না হলেও বর্ষায় বেশ প্রবাহ থাকে। কুচলিবাড়ি এলাকায় এই নদীর মাঝখানে নৌকার মতো একটি উঁচু স্থান রয়েছে। মিথ কথা অনুসারে সেখানে চাঁদসওদাগরের ডিঙা ডুবে গিয়েছিল। সেই থেকে এই স্থানটি উচু হয়ে রয়েছে। বর্ষাকালেও এই স্থানে জল উঠতে পারে না। এই নদী মধ্যবর্তী উচু জায়গায় রয়েছে বিভিন্ন দেবিদেবী মন্দির। স্থানীয় লোকেরা বিভিন্ন পূজা-পার্বণে এখানে পূজা দিয়ে থাকেন।

মেখলীগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন কুড়ার নাম:

মাতাজীর কুড়া: এটি মেখলীগঞ্জ মহকুমার মধ্যদিয়ে বয়ে চলা সানিয়াজান নদীর কুড়া। কুড়াটি রয়েছে নিজতরফ এলাকার বেলবাড়িতে। বহুকাল পূর্বে এই এলাকায় মাতাজির বসবাস ছিল, সেই মাতাজির নামেই কুড়ার নামটি পরিচিত হয়েছে। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গার নামেও এরকম শব্দের ব্যভার আছে, যেমন – মাতাজীর টারি, গোসাইর হাট, বৈরাহীর হাট, সৈন্ন্যাসীর হাট। অর্থাৎ কোচবিহার জেলায় বৈষ্ণব প্রভাব আগে থেকে ছিল।

পেরপেরুর কুড়া: মেখলীগঞ্জ মহকুমার সানিয়াজান নদীর একটি কুড়ার নাম পেরপেরু। কুড়াটির অবস্থান কামাতির বাড়ি এলাকার সানিয়াজান নদীতে। একসময় এইসব এলাকার নদী তীরবর্তী অঞ্চলে মানুষের বসবাস ছিল খুব কম। সেই সময়ে এই এলাকার স্থানীয় জমিদার ছিলেন জ্যারক্যারা নামে এক ব্যাক্তি। তার ছেলের নাম ছিল পেরপেরু। স্থানীয় এই জমিদারের নামে কুড়ার নামটি স্বীকৃত হয়েছে।

বসুনীয়ার কুড়া : এটি সানিয়াজান নদীর কুড়া। ভোটবাড়ি অঞ্চলের মিস্ত্রীপাড়া এলাকার পাশ দিয়ে প্রবাহিত সানিয়াজান নদীর মধ্যে এই কুড়াটি রয়েছে। কুড়াটি বন্যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় স্থানীয় জমিদার বসুনীয়া পদবীর লোকের নামে এই কুড়াটি নামকরণ হয়েছে। স্থানীয় জমিদার ছিলেন দূর্গা বসুনীয়া।

টয়রার কুড়া : সানিয়াজান নদীর প্রবাহ মিস্ত্রি পাড়া থেকে ধাইধাই ঘাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তার মাঝামাঝি অংশে একটি কুড়ার সৃষ্টি হয়, নাম টয়রার কুড়া। পূর্বে এই এলাকাগুলোতে লোকের বসবাস খুব কম ছিল। এই নির্জ্জন এলাকায় টয়রা নামে এক ধনি ব্যাক্তির বসবাস ছিল, সেই ব্যাক্তির নাম অনুসারে নিকটবর্তী কুড়ার নাম হয় টয়রার কুড়া। ব্যাক্তি নাম টয়রা, তার সাথে 'র' যুক্ত করে শব্দটি 'টয়রার' হয়েছে। রাজবংশী ভাষায় শব্দের শেষে এ রকম 'র'/এর ব্যবহার খুব বেশি দেখা যায়। লোকমুখে শোনা যায় এই কুড়া এতবেশি গভীর যে দশটি বড় বাঁশ কুড়ায় নিক্ষেপ করলেও তার তলদেশ স্পর্শ করা যেত না। লোক বিশ্বাসে উঠে আসে কুড়ায় অধিষ্ঠিত চণ্ডমকর দেবতার কথা। এই কুড়ায় পুজো না দিয়ে কেউ মাছ ধরতে পারতো না। ধূপ-ধুনো সহযোগে পুজো দিলে তবেই মাছ ধরতে পারতো।

বোয়ালমারি কুড়া : এটি একটি কুড়ার নাম। এই কুড়া বা গভীর গর্তে প্রচুর বোয়ামাছ পাওয়া যেতো। স্থানীয় লোকের আসেই বোয়ালমাছ ধরত। বোয়ালমাছের আধিক্য থাকায় সেই মাছের নামে কুড়ার নামটি বোয়ালমারি হয়েছে। 'মারি' প্রত্যয়ের ব্যবহার এই অঞ্চলে অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। মারি অর্থাৎ 'ধরা'। সেই অর্থে বোয়ালমাছ ধরা বোঝায়। ফাল্গুন – চৈত্র মাসেও এই কুড়ায় প্রচুর জল থাকতো।

মেখলীগঞ্জ শহরের পশ্চিম দিকে হলদিবাড়ি ব্লকের বিস্তৃত এলাকা এক সময় তিস্তা ভূগর্ভের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ফলস্বরূপ দেখা যায়, এই অঞ্চলের দোলাগুলি বেশ নিচু ও জলাশয়ে পূর্ণ। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আজও তার চিহ্ন বর্তমান রয়েছে। এরকম কুড়া ও জলাশয়ের অস্তিত্ব তাই এ অঞ্চলে অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হল বোয়ালমারি কুড়া। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে জানা যায়, এই কুড়ায় একসময় ১৫-২০ কিলোগ্রামের বোয়ালমাছ পাওয়া যেতো। মেখলীগঞ্জ থেকে জয়ী সেতু দিয়ে হলদিবাড়ি যাওয়ার পথে আঙুল দেখার নিকট বোয়ালমারি বাজারের পাশেই এই কুড়াটি অবস্থিত। এই এলাকায় এটি একটি বড় কুড়া। এটি কাউয়াসতী নালা/নদীর কুড়া। এক সময় এই কুড়াটি এতই অগভীর ছিল যে, স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হত – 'বড় বড় বাঁশও নাগাল পায় না'। বক্সীগঞ্জ অঞ্চলের দোলার জল যে নালা দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হত, সেই নালাই কাউয়াসতী নদী। এই কাউয়াসতী স্রোতোধারার একটি কুড়া হল এই বোয়ালমারি। এই কুড়ার পাশে বাসন্তীদেবীর পূজা ও বাসন্তী মেলা হয়।

মেখলীগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন জলাশয় ও মিথকথা:

আমতলি নালা : তিস্তা নদীর বন্যার ফলে এই নালা দিয়ে তিস্তার জল জোর দীঘিতে আসতো। ধাপড়া হাটের ভি আই পি মোর এলাকার পৈচতি থেকে শুরু করে পূর্ব দিক বরাবর প্রবাহিত হয়ে এই নালাটি উপনচৌকি

হয়ে কাশিয়ারটারি হয়ে পদ্মটারি এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হত। এই নালাতে একসময় অনেক কুড়া ছিল। এখন আগের মতো নালাটি প্রবাহ ও গতিপথ কিছুই নেই, কুড়ার নামগুলিও মানুষে ভুলে গিয়েছে। আমতলি কুড়াটি এখনও রয়েছে। কাশিকান্ত জমিদারের নামে এই এলাকার কাশিয়ারটারি নাম হয়েছে। নালো বুড়ার নামে নালোর টারি নাম হয়েছে।

বালাপুকুরি দীঘি : এই দীঘিটি রয়েছে মেখলীগঞ্জ মহকুমার ধাপড়া হাটের কাছে উপনচৌকি হাই স্কুলের কাছে। এই দীঘিটির বয়সও অনেক পুরোনো, প্রায় ১৫০ বছরের বেশি। লোককথা অনুসারে দেবতা বিশ্বকর্মা একই দিনে এই ধাপড়া হাট সংলগ্ন এলাকায় মোট তিনটি দীঘি খনন করেন, যথা – জোর দীঘি, বালাপুকুরি, কটিয়ার দীঘি। এই তিন দীঘির মধ্যে দূরত্বও তাই সমান সমান, পায় দুই কিলোমিটার। বালাপুকুরি নামটির মধ্যে বালা শব্দের ব্যবহারে বোঝা যায় এই পুকুরে বালা বা বালু মাটির আধিক্য বেশি। দিঘীর পাশে রয়েছে তিনবিঘা আন্দলনের শহীদ জিতেন রায়ের সহীদবেদী (২৬শে জুন ১৯৯২)। এই দীঘিটিও বর্তমানে গ্রামপঞ্চায়েতের অধিনে রয়েছে মাছ চাষের জন্য। দীঘির আয়তন প্রায় ১২ বিঘার কাছাকাছি।

বালাপুকুরি দীঘি

কটিয়ার দীঘি: স্থানীয় এক জমিদার কটিয়ার নামে এই দীঘির নামটি হয়েছে। সেই সময় এই এলাকার চারিদিকের জমি ছিল এই কটিয়া বুড়ার অধিনে। তার জমিতে দীঘিটি খনিত হওয়ার তার নামেই দীঘির নামটি পরিচিতি পায়। জোর দীঘি, বালাপুকুরি ও কটিয়ার দীঘি এই তিন দীঘি একই রাতে খনন করেছিলেন বিশ্বকর্মা। এই দীঘির সাথে অন্য দুই দীঘির দূরত্ব প্রার সমান, দুই কিলোমিটার। প্রায় ১৫০ বছর পুরোনো এই দীঘিটিও দেবতায় খনন করেছিলেন। এই দীঘিতেও একসময় সোনার চাইলন কুলা ভেসে ওঠার প্রসঙ্গ লোকমুখে শোনা যায়। দীঘির আয়তন প্রায় ১০ বিঘার কাছাকাছি। এই দীঘির এক কিলোমিটারের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা নদী। স্থানীয় লোকেরা কটিয়া বুড়ার নামেই এই দীঘিতে পূজা দিয়ে থাকেন।

কোঁদালধোয়া দীঘি : মেখলীগঞ্জ মহকুমার ধাপড়াহাট পার করে খামচার হাটের পাশেই রয়েছে এই দীঘিটি। হাঁড়িয়ে যেতে বসেছে। কোঁদালধোয়া শব্দের মধ্যে দুটি দল রয়েছে। কোঁদাল আঁদতে মাটি কাটার বিশেষ যন্ত্র। আর ধোয়া শব্দের অর্থ ধুয়ে ফেলা। যেখানে মাটিকাটার পর কোদাল ধোয়া হয়েছে। লোকমুখে শোনা যায় – দেবতা বিশ্বকর্মা এই এলাকায় তিনটি দীঘি যথাক্রমে জোর দীঘি, বালাপুকুরি ও কটেয়ার দীঘি খনন করার পর এই দীঘিতে এসে কোঁদাল ধুয়েছিলেন। সেই থেকে এই নামটি আজও স্থানীয় এলাকায় বেশ পরিচিত হয়ে রয়েছে। এই দীঘিটি সম্ভবত আরও পুরোনো দীঘি হতে পারে। কারণ দীঘিটি না থাকলে দেবতারা এখানে কোঁদাল ধুতে নামতেন না। এও দীঘির পাশে অনেক দেব-দেবীর মন্দির ও মূর্তি রয়েছে। যথাক্রমে বড় ভাণ্ডানি, শিব, পার্বতী, সৈন্ন্যাসী প্রমুখ।

মেখলীগঞ্জ তথা তিস্তা নদী তীরবর্তী এলাকায় জলসংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশি। নদী ও নদীকেন্দ্রিক জীবনচর্চায় নদী তীরবর্তী মানুষদের মধ্যে জলসংস্কৃতিকে পূজা করা রীতি আজও সমান ভাবে বহমান। নদীর সাথে নদীর বিবাহ, ভাই বোন পাতানো, দীঘিকে বরণ করা, গঙ্গা স্নান ইত্যাদি সংস্কৃতি কোচবিহার তথা মেখলীগঞ্জ মহকুমার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে আজও সমান ভাবে পালিত হয়। জলসূয়া নদীকে জলসূয়া পীড় হিসেবে পূজা করা হয় জামালদহ অঞ্চলে। সেখানে জলসূয়া পীড়কে মোরক নিবেদনের রীতি প্রচলিত আছে। [১০]

মেখলীগঞ্জ এলাকার তিস্তা তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ আজও সমানভাবে তিস্তা বুড়ির পূজো করে থাকেন। তিস্তার ভয়ালরুপ থেকে রক্ষা পেতে। মিথ কথায় উঠে আসে তিস্তার সাথে রঙ্গিতের প্রেম ভালোবাসার প্রসঙ্গ। এই তিস্তাবুড়ির ভয়ঙ্করী রূপ দেখে রাজবংশী সমাজের লোকেদের মুখে শোনা যায় সেই পরিচিত শ্লোক –

> "সগায় কছে তিস্তাবুড়ি
> বুড়ি না হয় জোয়ান চেঙেরী।।"[১১]

এছাড়াও বিভিন্ন কুড়াগুলি একসময় এতবেশি গভীর ছিল যে লোকে সেখানে নামতে সাহস পেতো না। কুড়ায় মাছ ধরতে গেলে কুড়ার দেবতাকে পূজো দিতে হত। মেখলীগঞ্জ এর বিভিন্ন কুড়ার দেবতা কোথাও বুড়া সৈন্ন্যাসী, কোথাও বুড়ি ঠাকুর। আর কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা মহকুমায় দেখা গেছে বেশির ভাগ কুড়ার দেবতা জলসূয়া মাশান ঠাকুর। মেখলীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জামালদহে সুটুঙ্গা নদীর একটি কুড়ার নাম ঘেগির কুড়া। এই কুড়াকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে ঘেগিবুড়ি ঠাকুরের মিথ কথা। ঘেগিবুড়ির মেয়ের সাথে তিস্তাবুড়ির ছেলে বিয়ে হয়েছিল। তাই দেখা গেছে এই দেবতার সাথে পুজিত হয়ে থাকে তিস্তা বুড়ি ও তার মেয়ে জামাই। সুটুঙ্গা নদীর পাশেই কুড়ার দেবতার স্থাপনা রয়েছে। সেখানে বাসন্তী পুজোর সময় চৈত্র মাসে শেষে অনেক বড় করে পুজো দেওয়া হয় এবং পুজো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক দিনের মেলাও। এই মেলাটির নামও ঘেগির মেলা। তাই মেখলীগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন নদ-নদী ও জলাশয়ের সাথে এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আজও অটুক। জলসংস্কৃতির সাথে এখানকার মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তি এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। নদীর বুকে বিভিন্ন ধরনের ধান

উৎপাদন করে এখানকার মানুষেরা স্বাবলম্বী হয়েছে, নদীর মাছ ধরে অর্থ উপার্জন করছে। এ যেন নদীর সাথে মানুষের এক জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক।

তথ্য সংগ্রহের ছবি: হলদিবাড়ি

তথ্যসূত্র :

১. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৪২০, পৃ. ৭২
২. চাকী, শ্রী বেবব্রত (সম্পাদক), উত্তর প্রসঙ্গ : বইমেলা সংখ্যা ২০১৯, ১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৮৯
৩. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৪২০, পৃ. ৭২
৪. দাস, রমা, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের গ্রামনাম প্রসঙ্গ, পত্রলেখা, ১০বি কলেজ রোড, কলকাতা – ০৯, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৫, পৃ. ১২
৫. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal: State of Kuch Behar, N.L. Publisher, Siliguri, Frist Published 1876, Trubner & Co, London, Reprint 2012, P. 5
৬. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৪২০, পৃ. ৪৭
৭. রায়, দীপক কুমার, তিস্তাবুড়ি, সোপান পাবলিশার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২১৪, পৃ. ১৩
৮. দাস, রমা, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের গ্রামনাম প্রসঙ্গ, পত্রলেখা, ১০বি কলেজ রোড, কলকাতা – ০৯, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৩
৯. দাস, রমা, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের গ্রামনাম প্রসঙ্গ, পত্রলেখা, ১০বি কলেজ রোড, কলকাতা – ০৯, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৫

১০. চাকী, শ্রী বেবব্রত (সম্পাদক), উত্তর প্রসঙ্গ : বইমেলা সংখ্যা ২০১৯, ১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৯২

১১. দাস, পর্বানন্দ, উত্তরের লোকায়ত জীবন (প্রথম খণ্ড), কালবৈশাখী, দিনহাটা, কোচবিহার, প্রথম প্রকাশ ২১শে জ্যৈষ্ট, ১৪১৯, পূর্ণিমা তিথি, পৃ. ৭৩

ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যদাতার তালিকা:

১. সলেমান মহম্মদ, বয়স ৯১, বসনিয়া পাড়া, বক্সীগঞ্জ, হলদিবাড়ি, কোচবিহার

২. সহিদার প্রামানিক, বয়স ৬০, ধাপের বাড়ি, উত্তর বড় হলদিবাড়ি, কোচবিহার

৩. শের আলী প্রামানিক, বয়স ৭০, ধাপের বাড়ি, উত্তর বড় হলদিবাড়ি, কোচবিহার

৪. সুল্পী দেব অধিকারী, বয়স ৭০, সরকার পাড়া, নগর সাহেবগঞ্জ, পার মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

৫. রবীন্দ্রনারায়ন রায় সরকার, বয়স ৭৪, সরকার পাড়া, নগর সাহেবগঞ্জ, পার মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

৬. প্রতিমা রায় সরকার, সরকার পাড়া, নগর সাহেবগঞ্জ, পার মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

৭. নগেন্দ্রনাথ রায়, বয়স ৬৯, বোয়ালমারি, খাসবস বাজেজামা, পার মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

৮. আব্দুল মালেক, বয়স ৬৫, হুদুমডাঙ্গা, দেওয়ানগঞ্জ, কোচবিহার

৯. রমনী বর্মন, বয়স ৭৩, ১৭৫ ধুলিয়া খালিসা, কামাখ্যার থান, উছলপুকুরি, কোচবিহার

১০. যতীন বর্মন, বয়স ৬৫, পাঁচকাটা, ১৬৫ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১১. উকিল বর্মন, বয়স ৬০, পাঁচকাটা, ১৬৫ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১২. নাল্টু বর্মন, বয়স ৬৬, দামের বাসা, ১৬৫ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১৩. মজেন বর্মন, বয়স ৬৬, দামের বাসা, ১৬৫ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১৪. কামিনী রায় ডাকুয়া, বয়স ৭০, ডাঙ্গাপাড়া, ২০৮ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১৫. মুকুন্দ বর্মন, বয়স ৭৮, ডাঙ্গাপাড়া, ২০৮ উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১৬. মফরুণ বেওয়া, বয়স ১০১, ডাকুয়াপাড়া, ১৬৪ গোপালপুর, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১৭. ভোলা বর্মন, বয়স ৬২, ১৫৬ দেউতিখাতা, উছলপুকুরি, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১৮. সাগর মণ্ডল, বয়স ৬০, চিতাইয়ের ডাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ, কোচবিহার

১৯. জিতেন বর্মন, বয়স ৮১, পাড়ের বাসা, ১৯২ ভোগজান, চ্যাংরাবান্ধা, কোচবিহার

২০. রবীন্দ্র বর্মন, বয়স ৭১, ১৯৩ রতনপুর, জামালদহ, কোচবিহার